মোকাম সদরঘাট

[উপন্যাস]

খোকার সদরঘাট

মনি হায়দার

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99801-8-6

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

মো কা ম স দ র ঘা ট
মনি হায়দার

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫
কপিরাইট © অনিন্দিতা লাবণ্য হায়দার পায়রা
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৭৭০ টাকা

Mokam Shodorghat
by Moni Haidar

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Anindita Labonno Haider Paira

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

নদীপথে যাত্রীদের
যারা প্রাণ হারিয়েছেন নৌ-দুর্ঘটনায়,
যাদের প্রত্যেকের প্রাণের মূল্য ছিল একটি ছাগল।
আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক এই উৎসর্গ।

এক

আপনে মোর গায়ে আত দেলেন ক্যা? আব্বায় কী কইছিল আপনারে? আর আপনে মোরে অপমান হরলেন? মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকারে নাবিক লঞ্চের দোতলায় তাস খেলায় মগ্ন জনা পঞ্চাশেক যাত্রী শব্দের উৎসে তাকায়। রাত সাড়ে এগারোটা। কাঠের কাঠামোর দোতলা লঞ্চ নাবিক রাত সাড়ে নয়টায় চাঁদপুর ছেড়ে এসেছে। লঞ্চটি সদরঘাট থেকে ছেড়েছে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। সদরঘাট থেকে ছেড়ে বাদামতলী পার হয়ে একটানা ঘণ্টা দুয়েক চালিয়ে রাত সাড়ে আটটায় এসে ভিড়েছে চাঁদপুর। চাঁদপুর থামা মানে ঘণ্টাখানেক ইঞ্জিন বন্ধ করে চুপ থাকা। কারণ, চাঁদপুর থেকে প্রচুর মালপত্র ওঠে লঞ্চে। এই নদীপথে ঢাকা থেকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যায় এই একটিমাত্র লঞ্চ, প্রতিদিন।

হাশেম মিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চোখ বড় বড় করে তাকায় চামেলির দিকে। চামেলির শরীরের রং ফর্সা কিন্তু আকারে একটু মোটা। পরেছে সালোয়ার-কামিজ। মাথাভরা চুল। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। দেখতে ভালোই। লঞ্চের ডান দিকে সিঁড়ির পাশে শাড়ি টাঙিয়ে আড়াল করেছে নিজেকে। কাপড়ের দুটো বোচকা দিয়ে বালিশ বানিয়েছে। শাড়ির বাইরে, পাশেই হাশেম মিয়ার লম্বা বিছানা। লঞ্চের অধিকাংশ যাত্রী ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু হাশেম মিয়ার চোখে ঘুম নেই। পাতলা একটা শাড়ির ওই পাশে একটা তেলতেলে মেয়ে শুয়ে আছে, শুনতে পাচ্ছে নিঃশ্বাস আসা-যাওয়ার শব্দ। চেষ্টা করছে সেই বিকেল থেকে চামেলিকে বাগে আনার, কিন্তু চামেলি যে ফোঁস করে উঠবে, বুঝতে পারেনি হাশেম মিয়া।

চুপ হরো চামেলি, মাইনষে হোনবে, ফ্যাসফেসে গলা হাশেম মিয়ার।

হোনলে হুনুক। আগে কন আপনে মোর গায়ে আত দেলেন ক্যা? চামেলির গলা আরও বাড়ছে। ভাসা ভাসা চোখের ভেতরটা জ্বলছে, আপনে মোরে চেনেন নাই। বিয়ালেই আমি বুঝছি, আপনে লোক ভালা না। আপনের চোহে বিষ। আপনে না বিয়া হরছেন? আমার চাচা লাগেন।

শাড়ির আড়ালের মধ্যে ঢুকে হাশেম মিয়া বলে, হোন চামেলি, যা অবার অইয়া গেছে। তুমি একটু চুপ থাহো। মাইনষে হোনলে আর ইজ্জত থাকবে নানে।

আপনে ইজ্জতের বোঝেনডা কী? আপনে মোর বুকে আত দিলেন ক্যা? গলা আরও বাড়ছে চামেলির। আব্বায় আপনারে কয় নাই, ইজ্জতের লগে রাকতে? এই আপনে আমারে ইজ্জতের লগে রাকলেন? সুযোগ পাইয়া আন্ধারে আমার বুহে আত দিলেন?

হাশেম মিয়া বুঝতে পারছে পরিস্থিতি যেকোনো সময় খারাপের দিকে যেতে পারে—লঞ্চের লোকগুলো জেগে উঠলে। ভাবনা শেষ হতে পারে না, তাস খেলার একটা দল ঝোলানো শাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। দলের মধ্য থেকে মিনহাজ হোসেন প্রশ্ন করে, কী হয়েছে? আমাকে খুলে বলেন আপনি। চোখ রাখে চামেলির দিকে, আমার বাড়ি পিরোজপুরের পাড়েরহাট। জগন্নাথ কলেজে পড়ি। বলেন আমাকে।

বাবা, কিছু অয় নাই। আপনেরা যান। আমার মাইয়া অয়, বড় ভাইয়ের মাইয়া, আমারও মাইয়া। হেয় রাগ করছে। মোরা মিডাইয়া হালামুআনে, আপনেরা যান। খুব মিনতির সঙ্গে বলে হাশেম মিয়া।

মিনহাজের পাশে দাঁড়ানো হাফিজউদ্দিন প্রশ্ন করে, আপনের বড় ভাইয়ের মাইয়া অইলে মাইয়ার বোহে হাত দেলেন ক্যা?

আস্তাগফিরুল্লা, খুব দরদের সঙ্গে উচ্চারণ করে হাশেম মিয়া। এইডা আপনে কী কইলেন? আস্তাগফিরুল্লাহ!

মাইয়াডা যে কইলো?

চিনি ছাড়া মজার গন্ধ পেয়ে আরও অনেকে জড়ো হয়েছে নাবিক লঞ্চের দোতলায়, সিঁড়ির আশপাশে। মজিরউদ্দিন যাবে মোরেলগঞ্জ। লঞ্চে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রস্রাবের বেগ উঠলে লঞ্চের পেছনের মাথা থেকে আসে ঘুমন্ত মানুষের মাথা-হাত-পা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে। সিঁড়ির পাশে এসে ঘুম ঘুম চোখে মিনিটখানেক দাঁড়ায়। কয়েকটি সংলাপ শুনে বুঝতে পারে ঘটনা। বিরক্তির সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলে, হারামজাদারে ধইরা নুনু কাইটা দেওন দরকার।

হালকা হাসির রোল পড়ে শাড়ির চারপাশে ঘিরে থাকা বিচিত্র যাত্রীদের মুখে। চামেলি থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। ঘটনা কী ঘটবে, কোন দিকে যাবে, কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। বেশ কয়েকবার লঞ্চে আসা-যাওয়া করেছে ও। কিন্তু সঙ্গে বাবা, বড় বোন, দুলাভাই বা ভাই ছিল। হাসিতে-আনন্দে আসা-যাওয়া করেছে চামেলি আখতার। পিরোজপুরের ভান্‌ডারিয়া উপজেলার উজানগাঁওয়ে বাড়ি চামেলিদের। পড়ে ভান্‌ডারিয়া কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে। ফাইনাল পরীক্ষা এসে পড়েছে, আর মাত্র দুই মাস বাকি। বাড়িতে যাওয়া দরকার। ঢাকা এসেছিল এক মাস আগে। চামেলির বাবা ইরফান বয়াতি চাকরি করে আর্মিতে। সুবেদার। বছর দুয়েক পরে অবসরে যাবে। বড় মেয়ে ঝিলমিলের জামাই মজনুন করিম চাকরি করে মিরপুরে একটা গার্মেন্টসে। সুপারভাইজার। বড় মেয়ে ঝিলমিলরা বেড়াতে গিয়েছিল গ্রামের বাড়ি। ফিরে আসার সময়ে বোনের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে চামেলি আখতার। পরীক্ষা কাছাকাছি চলে আসায় বাড়ি ফিরে আসার জন্য ছটফট করতে শুরু করলে ঝিলমিল বলে, অত চিন্তা হরিস না। তোর দুলাভাই দুই দিনের ছুটি লইয়া তোরে দিয়া আইবে।

হেই কতা হনতেছি আইজ দশ-বারো দিন ধইরা। দুলাভাইর ছুটির কী অইলো? আওনের সময়ায় মুই বইও আনি নাই। তহন তো কইছিলা, সাত-আষ্টো দিন পর মোরে পাঠাইয়া দেবা আফা, চামেলির গলায় উৎকণ্ঠা।

আরে ছেমড়ি, অত চিন্তা হরস ক্যা? তোর দুলাভাই ছুটি না পাইলে

আব্বায় তো আছে। ভরসা জোগায় ঝিলমিল বেগম ছোট বোনকে।

কিন্তু চামেলি আখতারের দুলাভাই মজনুন করিম ছুটি পায় না। শিপমেন্ট কাছে, মালিকের কোটি কোটি টাকার কারবার। ছুটি দেওয়ার সুযোগ নেই। একই অবস্থা চামেলির বাবারও। ছুটি পাওয়া যাবে না। সামনে ছাব্বিশে মার্চ। আর্মিদের বিশেষ অনুষ্ঠান আছে প্যারেড গ্রাউন্ডে। প্রশিক্ষণ চলছে। চামেলি পড়ে বিপদে। এক রাতে ব্যারাক থেকে মেয়ের বাসায় আসে ইরফান বয়াতি। জামাই মজনুন করিমের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয়, মেয়ে চামেলিকে নিয়ে সদরঘাটে যাবে।

প্রতিদিন একটা না একটা লঞ্চ থাকেই সদরঘাট থেকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে। আইবিটি বা ইসলাম ব্রাদার্স অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি থেকে বড় বড় তিনটি লঞ্চ চলাচল করে দীর্ঘ লম্বা পথে। লঞ্চ তিনটির নাম পূবালী, নাবিক, সাঁতারু। তিনটি লঞ্চই দোতলা। ছোট টিকিটে প্রধান অফিসের ঠিকানা লেখা, বেচারাম দেউড়ি, ঢাকা। বলা যায়, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ, আইবিটি কোম্পানির এই তিনটি লঞ্চ। প্রতিদিন একটি করে লঞ্চ আসে, একটি লঞ্চ যায়। কত ঘাটে ঘাটে ভেড়ে, মানুষ ওঠে-নামে। বিচিত্র এক যাত্রা। বিরাট লঞ্চের পেট বোঝাই হয়ে দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসে ডাব, সুপারি, আমড়া, কলা।

পরের দিন বিকেলে আর্মি মেস থেকে সন্ধ্যার ছুটি নিয়ে ইরফান বয়াতি আসে মিরপুরে বড় মেয়ে ঝিলমিলের বাসায়। নিজের ছোট্ট ব্যাগ, আর বড় বোনের দেওয়া টুকিটাকি নিয়ে আরও একটি ব্যাগ সাজিয়ে অপেক্ষা করছে চামেলি আখতার। বাবাকে দেখেই চটপট ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়ায়। ঝিলমিল ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরে, পরীক্ষাডা ভালো কইরা দিস।

আইচ্চা আফা! তুমি পারুল আর শিমুলকে বকাঝকা কইরো না। ছোট পোলাপান, অরা তো একটু দুষ্টামি হরবে। তুমি একটু সহ্য হইরো। মাইরো না। দুচোখে পানি আসে চামেলির। পারুল পড়ে ক্লাস ফোরে, শিমুল ওয়ানে। দুজনে জড়িয়ে ধরে খালাকে।

আধো কণ্ঠে শিমুল বলে চামেলির গলা জড়িয়ে, খালা তুমি যাইও না।

আহা রে সোনা আমার! আমার যে পরীক্ষা।

তোমার পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না, বলে পারুল।

ইরফান বয়াতি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাড়া লাগায়, অ্যাই ঝিলমিল! অগো সামলা। আতে সমায় নাই। এহনই বাজছে সাড়ে তিনটা। আগে না গেলে লঞ্চে জাগা পাওয়া যায় না।

আহো, আমার কাছে আহো, ঝিলমিল কোলে তুলে নেয় ছোট ছেলে শিমুলকে। আর হাত ধরে পারুলের, এই ছ্যামড়ি তুই বড় অইচোস না? সবই তো বোজো, ফাইভে পড়ো। তোর খালায় পরীক্ষা দিয়া আবার আইবে। ছাড় চামেলিরে।

ছাড়া পেয়ে দাঁড়ায় চামেলি। বাবার সঙ্গে বের হয়ে আসে বাসা থেকে। রিকশায় উঠে চলে আসে মিরপুর দশ নম্বর গোলচত্বরে। গোলচত্বর থেকে ওঠে একটা অটোয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সদরঘাটে পৌঁছালে, ইরফান বয়াতি দেখতে পায় বিরাট ঘাটে অনেক লঞ্চের সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নাবিক লঞ্চ। প্রচুর যাত্রী ওঠানামা করছে। মেয়ের হাত ধরে ইরফান বয়াতি লঞ্চের দোতলায় উঠে হতাশ, দোতলার মেঝেতে কোথাও পা রাখার জায়গা নেই। অনেক আগেই যাত্রীরা উঠে বিছানা পেতে দখলে নিয়েছে। লঞ্চ ছাড়তে আরও দেড় ঘণ্টা বাকি!

পরিস্থিতি বুঝে চামেলি মুখ খোলে, আব্বা?

কী? লঞ্চে ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকান ইরফান বয়াতি, দেখচো, এক বিন্দু জায়গা নাই। এর লাইগা কইছিলাম, আরও আগে আইতে।

এক কাম করা যায় আব্বা!

কী কাম?

কেবিন ভাড়া করা যায় না?

তুই জানো কেবিনের ভাড়া কত? এক দেড় হাজার টাহা..

আব্বা, আমি কইছিলাম কি! কয় বছর আগে ঈদের সময় আফা দুলাভাইর লগে বাড়ি গেছিলাম। তহনও মানুষের অনেক ভিড় ছিল। আমরা ছাদে গেছিলাম।

বিরক্ত ইরফান। লোকজন লঞ্চের দোতলায় নিজের বিছানায় যাচ্ছে, অনেকে জায়গা খুঁজছে। সব চেয়ে বড় সমস্যা, পরিচিত কাউকে পাচ্ছে না। যার কাছে মেয়েটির জিম্মা করা যায়।

তোর মাতা খারাপ অইচে? তহন তো লগে করিম আছিল, তোর বড় বুইনে আছিল। এহন তুই একলা। কেমনে ছাদে একলা একলা যাবি? বুদ্ধি সব গুইলা খাইচো? খাড়া এইহানে, হাতের ব্যাগটা চামেলির হাতে দিয়ে ইরফান বয়াতি লঞ্চের পেছনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে লঞ্চের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল, চারপাশের যাত্রীদের মুখ। না, একজনও এলাকার পাওয়া গেল না।

ষোড়শী মেয়ে চামেলিকে নিয়ে বিপদে ইরফান বয়াতি। মেয়েটিকে নিয়ে কী করবে? একটা কেবিন ভাড়া করে পাঠাবে? কিন্তু একা মেয়েটিকে পাঠানো ঠিক হবে? না, মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা দেখতে পায়। পত্রিকার পাতাজুড়ে সংবাদটি ছাপা হয়েছিল কয়েক দিন। অবশ্য ঢাকা-বাগেরহাট রুটের লঞ্চ ছিল না সেটা। সেই লঞ্চের রুট ছিল ঢাকা-লালমোহনের।

রিভার এক্সপ্রেস লঞ্চের যাত্রী ময়না আর রিফাত। স্বামী-স্ত্রী। লালমোহনের ছেলে রিফাতের বাড়ি বন্দরেই। পারিবারিক ব্যবসা লালমোহনে। দুটো খাবার হোটেল, তিনটা দোকান চালায় বাবা-ভাইয়েরা মিলে। বেশ কয়েকটা দোকানের ভাড়াও পায়। প্রেম করে বিয়ে করেছে ময়নাকে। বিয়ের মাস তিনেক পর ময়নার বড় বোন আসমার বাসায় ঢাকা বেড়াতে আসে ওরা। আসমার জামাই পুলিশের এসআই। ঢাকায় কয়েক দিন বেড়িয়ে 'দ্য রিভার এক্সপ্রেস' লঞ্চের কেবিন রিজার্ভ করে বাড়ি যাচ্ছিল ময়না আর রিফাত। শৌখিন বা আয়েশি যাত্রীরা কেবিনে আসা-যাওয়া করে। দোতলার ডান দিকে

সারিবদ্ধ দশটা কেবিনের মধ্যে কেবল ওরাই ছিল একটায়; বাকি নয়টা খালি। মেয়েটা, ময়না দেখতে দারুণ সুন্দরী। খোলা চুলে লাল রাজকন্যার মতো লাগে।

রাত বারোটার দিকে ওরা দুজনে যখন নির্জনে শরীরের শিল্প আবিষ্কারে মত্ত, দরজায় টোকার শব্দে দুজনে চমকে ওঠে। তাকায় পরস্পরের দিকে। আবার টোকা, একটু জোরেই অসহিষ্ণু টোকা বোঝা যাচ্ছে। দ্রুত দুজনে শিথিল হয়ে গেলে অসংবৃত কাপড়ে বাথরুমে ঢোকে ময়না। লুঙ্গি পেঁচিয়ে বিরক্তির সঙ্গে দরজা খোলে রিফাত। সামনে দাঁড়িয়ে তিনজন পুরুষ। একজনের পরনে লুঙ্গি। প্রত্যেকের চুল ছোট। 'দ্য রিভার এক্সপ্রেস' গভীর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের ওপর সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে।

কী চান আপনেরা? দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করে রিফাত।

একজন ওকে ঠেলে রুমের ভেতরে ঢোকে, দেখে রিফাত একলা। তাকায় খাটের নিচে, কেউ নেই। অবাক তাকায়, তোর লগের মাগিডা কই?

হতভম্ভ রিফাত, কী কন আপনে? আমার লগে আমার বউ।

রুমের বাইরে দাঁড়ানো একজন খিক খিক হাসে, আমরা দেখলেই কইতে পারি কে কার বউ আর কে মাগি? কই তোর লগের মাগি?

ভেতরের লোকটা বুঝতে পারে, মেয়েটা বাথরুমে। টোকা দেয় দরজায়। দরজা খোলে না। বেশ কয়েকবার টোকা দেওয়ার পরও যখন খোলে না, ভেতরের লোকটা ঠাস করে চড় মারে রিফাতের গালে, হারামজাদা বাইরে আইতে ক।

না, ঘাড় ফুলে যায় রাগে রিফাতের।

কয় কী হারামজাদা? পরপর কয়েকটা ঘুষি মারে রিফাতকে, বাইরের একটা লোক ভেতরে ঢোকে, দুজনে মিলে ঘুষি মারে। রিফাত কঁকিয়ে ওঠে। বাথরুমের দরজা খুলে যায়। খপ করে ময়নার হাত ধরে একজন, আয় মাগি বাইরে আয়। একটানে বাথরুম থেকে বাইরে আনে ময়নাকে। ময়না টানের টাল সামলাতে পারে না, হুমড়ি খেয়ে পড়ে

লোকটার মেদবহুল বুকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে ঝাপটে ধরে মুখ নামিয়ে আনে ময়নার মুখের ওপর। ময়না প্রাণপণে মুখটা দূরে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। পাশে দাঁড়ানো লোকটা পেছন থেকে ময়নার মাথাটা এগিয়ে ধরে। ময়নার কিছু করার থাকে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখটা এগিয়ে যায় লোকটার মুখের কাছে। লোকটার কামুক ঠোঁটজোড়া নেমে আসে ময়নার ঠোঁটের ওপর। রিফাত অনেকটা বিমূঢ়, হঠাৎ কয়েক মিনিটের বিপরীত দৃশ্যযন্ত্রণায়। স্ত্রীর মুখের ওপর লোকটার ঠোঁট স্পর্শ করতেই আচমকা ঘুষি মারে লোকটার চোয়াল বরাবর।

ও মাগো! লোকটা ময়নাকে ছেড়ে বসে পড়ে।

ময়না মুক্ত হয়ে জড়িয়ে ধরে রিফাতকে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে অবলম্বনের একমাত্র রশি হিসেবে। রুমের ভেতরের লোকটা একের পর একঘুষি মারতে শুরু করে রিফাতকে। বাইরের লোকটাও ভেতরে ঢোকে, দুজনে মিলে ঘুষি-লাথি মারতে-মারতে টেনে দুজনকে আলাদা করার চেষ্টা করে। ছোট্ট রুমটার মধ্যে গভীর রাতে কয়েকজন মানুষের মধ্যে চলে বাঁচা-মরার যুদ্ধ। এই যুদ্ধের মধ্যে আগে ঘুষি খাওয়া লোকটাও উঠে দাঁড়ায়। তীব্র আক্রোশে রিফাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুইজনের প্রবল জোরের সঙ্গে পারে না রিফাত। বুকের ওপর থেকে ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে ময়না, মাত্র তিন মাস আগে বিয়ে করা বউ। রিফাতকে ঠেলে নিচে ফেলে ঘুষি খাওয়া লোকটা গলার ওপর পা রাখে, রিফাতের শ্বাস আটকে যায়।

ময়না আবার ফিরে যায় তিনজনের একজনের বুকে। ময়না অনুনয় করে, হোনেন ভাইয়েরা, আমরা স্বামী-স্ত্রী। তিন মাস আগে মোগো বিয়া অইচে। মোরা ঢাকায় বেড়াইতে আইছিলাম।

চোপ মাগি! কতা কম। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরা লোকটা অন্য দুজনকে বলে, তোরা হারামজাদারে টাইনা রুমের বাইরে লইয়া যা। বাকি দুজনে হুকুম তালিম করে। রিফাত জ্ঞান হারিয়েছে। ওকে ধরে টেনে রুমের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় লোকটা লুঙ্গিটা খুলে বিছানার ওপর জোর করে শুইয়ে উঠে বসে ময়নার ওপর।

আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ ছিল। নদীর মাঝ বরাবর চলছে বিরাট লঞ্চ তীরভাঙা ঢেউয়ের তীব্র গতিতে। সেই গতির কাছে ময়না নামক এক গৃহবধূর সম্ভ্রম রক্তাক্ত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গভীর গহ্বরে। মেয়েটির শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে সর্বনাশের অকূল থেকে কূলে ফেরার, দুহাতে লোকটার মুখ ঠেলে ধরছে প্রাণপণে।

লোকটা যখন ময়নার মুখের ওপর মুখটা আনতে পারছে না, দুহাতের ক্রমাগত বাধায়, দরজায় অপেক্ষায় থাকা একজনকে ডাকে, এই হানিফ ভেতরে আয়। মাগির হাত দুইটা ধর। হানিফ ভেতরে ঢুকে জান্তব হাসিতে ময়নার হাত দুটো ধরে মাথার পেছনে নিয়ে টেনে ধরে। লোকটা কোমর চালাতে শুরু করে। রুমের বাইরে ঠান্ডা মেঝেতে পড়ে থাকা রিফাত চোখ মেলে তাকায়।

দুই

রিফাত চোখ মেলে কিন্তু শরীরে শরীর নেই। প্রচণ্ড মারে শরীর ভেঙে চুরে যাচ্ছেতাই, দুর্বল। গলার ওপর প্রচণ্ড জোর দিয়ে চাপ দিয়েছিল লোকটা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে রিফাতের। মুখটা দরজার পাশেই, চোখে দেখতে পাচ্ছে ময়নার শরীরের ওপর একটা দানব অস্ত্র শানাচ্ছে, ময়না গোঁ গোঁ শব্দে শরীর নাড়াচ্ছে, ছটফট করছে নিজেকে রক্ষার, কিন্তু দুই দানবের পৈশাচিক কামনার কাছে হেরে যাচ্ছে।

রিফাত প্রবল মনোযোগ দিয়ে বসার চেষ্টা করছে, কেবল কোমর সোজা করেছে, পেছন থেকে পিঠের ওপর ভয়ংকর এক লাথি এসে পড়লে কিছু বোঝার আগেই ছিটকে সামনে রাখা বড় চেয়ারের হাতার

ওপর পড়ে মাথা ফেটে যায়। প্রথম লোকটা কাজ করে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকটা প্যান্ট খুলে ভেতরে ঢুকে বিছানার ওপর ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে হাত ধরে বসা লোকটা, এখন আমি করব।

শালা, তুই দুধ হাতা, আমি সারি আগে। তোর সিনিয়ার না?

তিনজনে কাজ করে শরীর ঠান্ডা করে বুদ্ধি করতে বসে বারান্দায়, দুটাকে নিয়ে কী করা যায়! সিনিয়ারটা বলে, কী আর করবি? আগে যা করতাম সেটাই কর। দুইটাকে নদীতে ফালায়ে দে।

তিনজন পুরুষের নিখাদ অত্যাচারে ময়না অজ্ঞান বিছানার ওপর। রাত শেষের দিকে। লঞ্চ আধা ঘণ্টার মধ্যে পদ্মা পাড়ি দিয়ে পাড়ে পৌঁছে যাবে। যা করার এই গহিন পদ্মায় করতে হবে। তিন আনসার মিলে প্রথমে ময়নাকে, পরে রিফাতকে ছাদের ওপর দিয়ে গহিন জলে ফেলে দেয়।

লালমোহনে ছেলে ও পুত্রবধূ ফিরে না যাওয়ায় রিফাতের বাবা মেয়ের জামাইকে চিঠি লেখে। চিঠি পড়ে তো আসমার জামাই, পুলিশের এসআই বদরুদ্দিন অবাক। স্ত্রী আসমাকে বদরুদ্দিন বলে, ঘটনা কী? আমি নিজে রিফাত আর ময়নাকে 'দ্য রিভার এক্সপ্রেস' লঞ্চে কেবিনে তুলে দিয়ে এলাম, কিন্তু আজ পনেরো দিন, ওরা বাড়ি যায়নি? মাথা নাড়ে বদরুদ্দিন, কোথাও ঝামেলা হয়েছে। পুলিশের মন, কূ গেয়ে ওঠে। পরের দিন সদরঘাটে এসে বদরুদ্দিন দ্য রিভার এক্সপ্রেস লঞ্চের অফিসে যায়। পুরো ঘটনা জানায় ম্যানেজার আশীষ স্যানালকে।

তো আমরা কী করতে পারি?

আমি অলরেডি কোতোয়ালি থানায় ডায়েরি করে ওসি খায়রুজ্জামান স্যারকে সব জানিয়ে এসেছি। খুব শিগগির আইও পাঠাবেন, আমি আগে চলে এসেছি।

আশীষ স্যানাল দেখল, বিপদ ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। ফোন করে মতিঝিলের হেড অফিসে। প্রশাসনের ডিরেক্টর জানায়, যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে পুলিশ তো তদন্ত করবেই। তদন্তে সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব। যদি কেউ অপরাধ করে থাকে, বিচারও হওয়া দরকার।

ঠিক আছে স্যার, আমি দেখছি।

কোতোয়ালি থেকে ডায়েরির তদন্ত কর্মকর্তা হেলাল আরও তিনজন পুলিশ সদস্য নিয়ে হাজির। আশীষ স্যানাল সবাইকে নিয়ে অফিস রুম থেকে সদরঘাটের দিকে আসে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। অনেক লঞ্চ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সদরঘাটের বিশাল টার্মিনাল জুড়ে। খালাসিরা চিৎকার করছে যাত্রীদের লঞ্চে ওঠার জন্য। তেলবাহী বিশাল জাহাজ লঞ্চে পরিণত করেছে একটা কোম্পানি। লঞ্চটা ঢাকা থেকে বরিশাল যায়, নাম সামাদ। খালাসিরা চিৎকার করছে, আগে গেলে সামাদে, আগে গেলে সামাদে। ফেরিঅলারা চিৎকার করে, অ্যাই পাউরুটি, পাউরুটি। এই সেদ্ধ ডিম, লাগবে সেদ্ধ ডিম। চাই কলা, পাকা কলা...। সেই সঙ্গে আসছে দলে দলে যাত্রী, নানা দিক থেকে। সদরঘাটের যাত্রীদের কোলাহল, লঞ্চের বিচিত্র শব্দ, খেয়ানৌকার আনাগোনা, ফেরিঅলাদের গলার ঝঙ্কারের মধ্যে হেলাল, বদরুদ্দিন ও পুলিশ সদস্যরা 'দ্য রিভার এক্সপ্রেস' লঞ্চে উঠে দোতলার একেবারে কর্নারের বত্রিশ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়ায়।

বদরুদ্দিন জানায় হেলালকে, স্যার এই রুমে আমি নিজে উঠিয়ে দিয়ে গেছি ওদের। রুমের সামনে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করেছি ওদের সঙ্গে। লঞ্চ ছাড়ার বিশ মিনিট আগে আমি নেমে যাই। কিন্তু গতকাল লালমোহন থেকে আমার শ্বশুর চিঠি লিখেছেন, আমার শ্যালক রিফাত আর রিফাতের বউ ময়না বাড়ি যায়নি আজও। তখনই আমার মাথায় আসে, এই লঞ্চ, এই রুম।

ঠিক আছে, আমি দেখছি। ওপরে আসার সময়ে লঞ্চের সুপারভাইজার নিজামুদ্দিন আর টিকিট মাস্টারকেও আসতে বলেছে। সেই দুজনের সঙ্গে লঞ্চের আরও কয়েকজন স্টাফ এসে দাঁড়িয়েছে। হেলাল তাকায় সুপারভাইজার নিজামুদ্দিনের দিকে, আপনার এই কেবিনের যাত্রী দুজন বাড়ি যায়নি। ওরা আপনার লঞ্চে উঠেছিল পনেরো দিন আগে।

স্যার, যাত্রী দুজনের কেউ কি মেয়ে ছিল? প্রশ্ন করে লঞ্চের

মাঝবয়সি খালাসি এরফান। কালোজামের কালো শরীর। মাথায় আরও কালো চুল। চোখ দুটো শরীরের তুলনায় ছোট।

মাথা ঝাঁকায় বদরুদ্দিন, হ্যাঁ, একজন আমার শ্যালক রিফাত আলমগীর। আর একজন ওর বউ ময়না।

সবাই চুপ। নিচের দিকে তাকিয়ে এরফান। ধমক দেয় সুপারভাইজার, তোমারে কেডায় ডাকছে এইহানে! যাও, যাও নিচে।

না, বাধা দেয় এসআই হেলাল। বলে, তুমি যাবে না। কী নাম তোমার?

এরফান।

গুড, তুমি কিছু জানো?

এরফান নিচের দিকে তাকিয়ে হাতের নখ খোটে। সবাই তাকিয়ে ওর মুখের দিকে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

তুমি উত্তর দাও আমার প্রশ্নের! এরফান তুমি কিছু জানো? দেখো, দুজন মানুষের কোনো খবর নেই আজ পনেরো দিন। বাবা-মা-আত্মীয়স্বজন অপেক্ষায়। জানলে বলো, এরফানের কাঁধে হাত রাখে এসআই হেলাল। আশ্বাস দেয়, তোমার কোনো ভয় নেই। আমরা আছি তোমার সঙ্গে।

স্যার, আনসারদের জিজ্ঞাস করেন, খুব নিচু কণ্ঠে উত্তর দেয় এরফান।

কী কইতেছিস তুই? খেঁকিয়ে ওঠে সুপারভাইজার নিজামুদ্দিন। লঞ্চের যেকোনো ঘটনা, দুর্ঘটনার জন্য দায়ী থাকে সুপারভাইজার। মালিক খেয়ে ফেলবে, চাকরি থাকবে কি থাকবে না।

হেলাল কড়া চোখে তাকায় নিজামুদ্দিনের দিকে, আপনার সমস্যা কী? কেন এরফানকে ধমক দিচ্ছেন? বুঝতে পারছেন না দুজন মানুষ আপনার লঞ্চ থেকে নিখোঁজ?

স্যার যে কী কন! হালকা পরিহাসের কণ্ঠে বলে নিজামুদ্দিন, আমার লঞ্চ থেকে মানুষ নিখোঁজ অইবে ক্যানো? আমি এই রিভার লঞ্চের দায়িত্বে আছি সাত বচ্চর, আইজ পর্যন্ত কোনো দূর্ঘটনা ঘটে নাই।

আপনার নাম কী?

থতমত খেয়ে তাকায় সুপারভাইজার, আমার নাম নিজামুদ্দিন।

শুনুন নিজামুদ্দিন, আপনি সেই দিন, আজ থেকে পনেরো দিন আগের রাতে আনসারদের ডিউটির রোস্টারটা আনুন।

স্যার, আনসারদের ডিউটি রোস্টার দিয়ে কী করবেন?

আপনি বড় বেশি বকেন নিজাম সাহেব। আমি যা বলছি, সেটা করুন, ধমক দেয় হেলাল।

যাইতেছি, নিজামুদ্দিন যাওয়ার জন্য ফিরছে।

বাধা দেয় হেলাল, না। আপনি যাবেন না। আপনার একজন স্টাফ পাঠান। এখানে থাকেন আপনি।

সুপারভাইজার নিজামুদ্দিন থমকে বড় বড় চোখে তাকায় হেলালের দিকে, হেলালও তাকিয়ে থাকে। অনেক দিনের অভিজ্ঞতা হেলালের। বুঝতে পারছে ঘটনাটা। শরীর শিউরে উঠছে। সময় নেই, তাড়াতাড়ি পাঠান।

এরফান, যাও আমার রুম দিয়া আনসারদের ডিউটির রোস্টার খাতাটা আনো।

না, এরফানও যাবে না। আপনি অন্য কাউকে পাঠান।

পাশে দাঁড়ানো সারেং জুলমত আলীকে বলে, আপনে যান। কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে হাতে দেয়, আমার রুমের টেবিলের ওপর আচে আনসারদের ডিউটির রোস্টার। লইয়া আহেন।

চাবি নিয়ে চলে যায় জুলমত আলী। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দাঁত ব্রাশ করতে করতে আনসারদের অধিনায়ক মোহন মিয়া তিনতলার সারেংয়ের রুমের পেছনের নিজের রুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামে। ইচ্ছে মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এক কাপ চা আর একটা বিস্কুট খাবে। কিন্তু দোতলায় নামতেই লোকের ভিড়, বিশেষ করে সুপারভাইজারকে দেখে এগিয়ে আসে। জটলার কাছে রুম নম্বর বত্রিশের সামনে এসে পুলিশ দেখে দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ নম্বর রুমের সামনে বিরক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বদরুদ্দিন সবাইকে

ডিঙিয়ে দ্রুত এসে মোহন মিয়ার কাঁধ ধরে, শুনুন।

ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হয় মোহন মিয়া, আমারে কইতেছেন?

হ্যাঁ, এদিকে আসুন। একধরনের জোর করেই সবাইকে ডিঙিয়ে বত্রিশ নম্বর রুমের সামনে নিয়ে আসে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছে মোহন মিয়া। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে, আমারে এইহানে আনলেন ক্যা?

আপনার নাম কী?

বিরক্তি ফুটিয়ে তোলে দুই চোখে আর কপালের মাঝখানে, আপনে কিডা?

এসআই হেলাল উত্তর দেয়, উনি এএসআই বদরুদ্দিন। সাদা পোশাকে আছেন। আমরা একটা কেসের তদন্তে আছি।

তো আমারে আনছেন ক্যা? মুখের পেস্ট শুকিয়ে গেছে, গলা আটকে আসছে মোহন মিয়ার। পাশেই পানির কলে মুখ ধোয়ার জন্য ইশারা করে হেলাল। মুখ ধুয়ে ফিরে দাঁড়াতেই সুপারভাইজারের রুম থেকে আনসারদের ডিউটি রোস্টার নিয়ে হাজির সারেং।

এএসআই বদরুদ্দিনের স্পষ্ট মনে আছে, বত্রিশ নম্বর কেবিনের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাতাস মাখতে মাখতে সিগারেট টানছিল। রুমের ভেতর ব্যাগ রেখে রিফাত আর ময়না সামনে এসে দাঁড়ায় বদরুদ্দিনের সঙ্গে। ময়না চুলের বেণি দুলিয়ে দুষ্টুমি করে, ভাইজান লঞ্চে তো আইয়াই পরচেন। লন আমাগো লগে লালমোহন।

আমি তো তোমার সঙ্গে যাইতেই চাই, সিগারেটের ধোঁয়া উগড়ে বলে বদরুদ্দিন, কিন্তু তোমার আপায় বাসায় উঠতে দেবে না।

খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ে ময়না, আপনে আপারে খুব ভয় পান বুঝি?

তোমার জামাই রিফাত সাব তোমাকে ভয় পায় না?

একটুও ভয় পায় না। উল্টো আমারে ভয় দেখায়।

ওদের এই সব হাসিঠাট্টার সময়ে নাবিক লঞ্চের আনসারদের কমান্ডার মোহন মিয়া বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। অপাঙ্গে তাকায় ময়নার

দিকে। সুন্দরী নারী হলে পুরুষ তো তাকাবেই। মোহন মিয়াও তাকিয়েছিল, কয়েকবার আনাগোনা করেছে সিভিল পোশাকে। থুতনির নিচে এক চিলতে দাড়ি দেখে চিনতে পেরেছে, এই লোক সেই দিন ময়নাকে দেখার জন্য বেশ কয়েকবার বারান্দায় আসা-যাওয়া করেছে।

আপনি কে?

আমি মোহন মিয়া, চোখেমুখে বিরক্তি ফুটিয়ে তোলে। বলে, আমি লঞ্চের আনসার কমান্ডার। লঞ্চের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। কী হইচে বলেন।

এসআই হেলাল পুরো ঘটনা আবার শুনিয়ে প্রশ্ন করে, রিফাত আর ময়না কোথায় গেল? আজ পনেরো দিন বাসায় যায়নি কেন?

সেটা আমি ক্যামনে বলব?

হেলাল স্যার, আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন আগে বিকেলে এইখানে দাঁড়িয়ে আমি, ময়না আর রিফাত নানা বিষয়ে আলাপ করছিলাম। সেই সময়ে এই লোক, লঞ্চের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আনসার কমান্ডার মোহন মিয়া আমাদের সামনে দিয়ে বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়া করেছে। চোখ ছিল ময়নার ওপর। আমি মোহন মিয়ার থুতনির নিচের এই দাড়ি দেখে চিনেছি।

আমি দেখছি, আপনি বিচলিত হবেন না। আশ্বাস দেয় হেলাল।

সারেংয়ের হাত থেকে ডিউটির রোস্টার নিয়ে দেখে, পনেরো দিন আগের দিন রাতে কে কে দায়িত্বে ছিল লঞ্চের নিরাপত্তায়, রোস্টারে ঠিকভাবে লেখা নেই। শুধু ওই দিন না, প্রায় প্রতিদিনের তারিখে দেখা যায়, তারিখ সময় লেখা ঠিকই আছে কিন্তু কারও নাম নেই, সাদা পাতা।

রোস্টারে দায়িত্বরতদের নাম নেই কেন?

হেলালের প্রশ্নের উত্তরে আমতা আমতা করে মোহন মিয়া, মাসের শেষের দিকে...

বুঝতে পারছি। হাসান গ্রেপ্তার করো মোহন মিয়াকে। সঙ্গে সঙ্গে মোহন মিয়ার দুই হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয় কনস্টেবল হাসান।

মোহন মিয়া তোতলাতে শুরু করে, স্যার আমি কী করচি? আমারে গ্রেপ্তার হরলেন ক্যা?

চুপ, ধমক দেয় হেলাল, আনসাররা কোথায় থাকে?

তিনতলায়, সারেংয়ের রুমের পেছনে ওদের জন্য রুম বরাদ্দ। জবাব দেয় সুপারভাইজার।

চলো, সবাইকে নিয়ে তিনতলার আনসার রুমের সামনে যায় হেলাল, বদরুদ্দিন, নিজামুদ্দিন, মোহন মিয়া। আনসাররা কেউ কেউ ডিউটির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, কেউ ঝিমাচ্ছে, কেউ ঘুমুচ্ছে। দরজার সামনে মোহন মিয়াকে হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় দেখে আনসাররা হতবাক। পরিস্থিতি দেখে লুঙ্গি পরা জামা গায়ে সমীর চক্রবর্তী নিরীহ ভাব দেখিয়ে রুমের বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজা পার হচ্ছিল।

হাত ধরে হেলাল, আপনি কে?

পুরো শরীর কাঁপে, মুখে জড়তা, আমি সমীর চক্রবর্তী।

আনসার?

মাথা নাড়ায় সমীর, জি।

হেলাল তাকায় পুলিশ সদস্যদের দিকে, নরেন্দ্র?

স্যার?

ওর হাতেও হ্যান্ডকাফ লাগাও।

মুহূর্তের মধ্যে সমীর চক্রবর্তীর হাতে হ্যান্ডকাফ লাগায় নরেন্দ্র রায়। মোহন মিয়া আর সমীর চক্রবর্তীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে হেলাল। বসে চেয়ারে, আনসারদের সবাই দাঁড়ায়। পরিস্থিতি একবারে ঘোলাটে। রুমের বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে বদরুদ্দিন। গোটা ঘটনা চোখের সামনে ভাসছে। নিশ্চিত, রিফাত আর ময়না বেঁচে নেই। নদীর জল বিলীন করেছে দুজনকে। কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনা কীভাবে জানাবে শ্বশুর-শাশুড়িকে? নিজের বউকে কী করে বলবে? আসমা ছোট ভাইটাকে অসম্ভব ভালোবাসে। লালমোহন চলে আসার সময়ে রিফাতকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল আসমা, যহন একা ছিলি বছরেও আমারে দেখতে আইতি না। এহন বিয়া করচো, দশ

বছরেও আমারে দেখতে আসবি না তুই।

হাসছিল ময়না, আপা রিফাত আর মুই বছরে দুইবার কইরা আপনেরে দেখতে আমু। আর আপনেও তো যাইবেন।

সেই ভাই আর ভাইয়ের মৃত্যুর নির্মম সংবাদ কীভাবে জানাব? নিজের মনে জিহ্বায় দাঁত ফেলে কামড় দেয় আর হাঁটে সারেং রুমের সামনে। তাকায় চারপাশে বদরুদ্দিন, কোলাহল ক্রমশ বাড়ছে। দূরে, দক্ষিণে দেখা যায় প্রথম বুড়িগঙ্গা সেতু। রেখার অঙ্কনে বাস ট্রাকের চলাচল দেখতে পাচ্ছে। নাবিক লঞ্চের পেছনে, বুড়িগঙ্গার ওপারে দখলদারদের সারি সারি সাদা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে। বিল্ডিংয়ের আশপাশে জাহাজের বডি তৈরির কারখানায় কাজ চলছে।

ডেকের একেবারে সামনে চলে যায় বদরুদ্দিন।

স্যার?

তাকায় বদরুদ্দিন, পুলিশ কনস্টেবল আরিফ দাঁড়িয়ে, আপনাকে হেলাল স্যার ডাকছে।

চলো, সিগারেটের শেষ অংশ নদীর জলে ফেলে এগিয়ে যায় আনসার ক্যাম্পে। সবার মুখ থমথমে। হেলাল তাকায় বদরুদ্দিনের দিকে। পুরো কক্ষটার মধ্যে বিষাক্ত নীরবতা থই থই করছে।

বদরুদ্দিন, বসেন।

একটা বেঞ্চের ওপর বসলে হেলাল তাকায় সুরুজ আলীর দিকে, এখন বলেন সুরুজ।

ভ্যা ভ্যা কাঁদতে শুরু করে সুরুজ আলী। থলথলে মোটা শরীর সুরুজের। চওড়া মুখের নিচে সরু মুখ। নাকটা বেঢপ চ্যাপটা।

ওই মিয়া ভোদড়ের মতো কাঁদেন কেন? বলেন, ধমক দেয় হেলাল। হাতে সময় নেই।

স্যার আমার কোনো দোষ নাই। আমি যাইতে চাই নাই। কিন্তু আমাদের কমান্ডার মোহন স্যার আমাকে ভয় দেখায়, চল। মজা পাবি। সুন্দর মাইয়া। আমি কমান্ডার স্যার আর সমীর চক্রবর্তী মিলে রাত তিনটার দিকে দোতলায় কর্নারে, বত্রিশ নম্বর রুমের সামনে যাই।

কাজ শেষ করার পর মেয়েটা অধমরা হয়ে যায়। আর ছেলেটার গলায় পা দিয়ে চেপে ধরেছিল সমীরদা। শ্বাস বন্ধ হয়ে ছেলেটাও আধমরা অবস্থা। লালমোহনের আগে ইলিশা যাওয়ার পথে আমরা তিনজনে মিলে ছাদের ওপর থেকে দুজনকে ফেলে দিই।

সঙ্গে সঙ্গে বদরুদ্দিন উঠে একের পর এক ঘুষি মারতে থাকে সুরুজ আলীর মুখের ওপর। হেলাল ঝাপটে ধরে বদরুদ্দিনকে, থামুন থামুন আপনি। আপনি না পুলিশ? আবেগ সামলান।

জোর করে টেনে বেঞ্চের ওপর বসায় বদরুদ্দিনকে। বসেই হাউ-মাউ কাঁদতে শুরু করে, হেলাল ভাই আমার বউকে কীভাবে বলব ওর আদরের ছোট ভাইয়ের মৃত্যু, ছোট ভাইয়ের নতুন বউয়ের মৃত্যু। আমি বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে কীভাবে জানাব, প্রিয় সন্তানের অকাল মৃত্যুর ঘটনা।

সদরঘাটের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে বদরুদ্দিনের কান্নায়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় নাবিক লঞ্চ ছেড়ে যায় সদরঘাট। ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে এসআই হেলাল ও এএসআই বদরুদ্দিনের নেতৃত্বে নাবিক লঞ্চের সুপারভাইজার নিজামউদ্দিন, আনসার কমান্ডার মোহন মিয়া, আনসার সদস্য সমীর চক্রবর্তী ও সুরুজ আলীকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নামিয়ে নিয়ে যায়। সদরঘাটের মূল টার্মিনাল থেকে লঞ্চ পেছনে যেতে থাকে, সারেং ঘণ্টি বাজায় ওপর থেকে।

তিন

হঠাৎ এক ফালি ঈদের চাঁদের আকারে দেখতে পায় আবির হাসান দোতলা পূবালী লঞ্চের মাথা।

খুব সকালে রায়েন্দা স্টেশন ধরে পূবালী লঞ্চটি বলেশ্বর নদের

স্রোত পার হয়ে শরণখোলা-তুষখালী-বালিপাড়ার চতুর্মুখী তীরের চক্রে, বলেশ্বর, কচা আর পানগুছি নদীর ত্রিমুখীসংগম পাড়ি দিয়ে তীব্র স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতার কেটে কেটে আসছে। কচা নদীর তীরে ছোট গঞ্জ তেলিখালীর লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে অনেক যাত্রীর সঙ্গে অপেক্ষা করছে আবির। পরনে পুরোনো প্যান্ট। গায়ে আরও পুরোনো কালো রঙের শার্ট। হাতে নায়লনের ঝুলন্ত ব্যাগ। ব্যাগে আরও দুটি পুরোনো শার্ট, একখানা লুঙ্গি, গামছা আর দুই-তিনটি গল্পের বই।

মার্চের সকালে হালকা শীত। নদীর ভেজা বাতাসে অনেকে দাঁড়িয়ে চা-সিগারেট-বিড়িতে মগ্ন। তেলিখালী প্রবল ভাঙনকবলিত এলাকা হওয়ার কারণে লঞ্চ ভেড়ার জন্য কোনো টার্মিনাল নেই। লঞ্চের মাথা সরাসরি কাদার মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকে। খালাসিরা লঞ্চের সামনে থেকে লম্বা কাঠের সিঁড়ি ফেলে। সেখান দিয়ে যাত্রীরা প্রথমে নামে। লঞ্চের যাত্রীদের নামা শেষ হলে অপেক্ষারত যাত্রীরা ওঠে। উঁচু পাড়ের নিচে প্রবল স্রোতের সঙ্গে বাঁধা কয়েকটা টাপুরে নৌকা দুলছে। নদীর মাঝ বরাবর স্রোতের সঙ্গে বুক রেখে ভেসে যাচ্ছে সবুজ কচুরিপানা।

যাত্রীরা বারবার তেলীখালি লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে জুনিয়া আর বালিপাড়ার যৌথ কচা নদীর বাঁকে চোখ রেখে দেখছে, পূবালী আসছে কি না! দুই-একজন যাত্রী দাঁড়িয়ে থাকা ফেরিঅলাদের জিজ্ঞেস করে কনফার্ম হতে চাইছে, গতকাল দুপুরে তেলিখালী ঘাটে লঞ্চটা ভিড়েছিল কি না, ঢাকা থেকে এসে।

ফেরিঅলা বাবুল মিয়া ডালার বাদাম ঠিক করতে করতে জবাব দেয়, হয় হয়। মুই তো কাইল ভান্‌ডারিয়া দিয়া পূবালী লঞ্চে বাদাম বেচতে বেচতে তেলিখালী নামছি।

তাইলে তো ঠিকই আছে। যাত্রী আশ্বস্ত হয়। ঠিক সময়ে চিৎকার দিয়ে আবির জানায়, বালিপাড়ার ঠোডায় লঞ্চটা দেহা যাইতেছে।

আবিরের চিৎকারে লঞ্চঘাটে উপস্থিত যাত্রীরা তাকায়, ওর হাতের ইশারা লক্ষ করে। কেউ কেউ দেখতে পায়, হালকা কুয়াশার পর্দা ভেদ